নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রাণপুরুষ, প্রধান কারিগর ও তাত্ত্বিক চারু মজুমদার (১৯১৯-১৯৭২)

শোষিত জনগণের বন্ধনমুক্তি

উচ্চ পর্যায়ের সাংস্কৃতিক মননই মানুষকে স্বপ্ন দেখায়, বর্তমানকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের এক বিকল্পের সন্ধান দেয়।

বইটি নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রাণপুরুষ, প্রধান কারিগর ও তাত্ত্বিক চারু মজুমদারের (১৯১৯-১৯৭২) একটি তথ্যনিষ্ঠ জীবন-আলেখ্য। যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে, প্রচুর পরিশ্রম করে লেখক এই কাজটি সম্পন্ন করেছেন। তথ্যের সিংহভাগ অংশ হল চারু মজুমদারের নিজস্ব রচনা এবং তাঁর সহযোদ্ধাদের স্মৃতিতে উঠে আসা তাঁকে নিয়ে নানা ভাবনা। ফলে পাঠক দু'টি বিষয় সম্পর্কে অবহিত হন। একটি হল চারু মজুমদারের যাঁরা মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, তাঁরা তাঁকে কী চোখে

সত্তরের স্বপ্নযোদ্ধা চারু মজুমদার
অশোককুমার মুখোপাধ্যায়
আনন্দ পাবলিশার্স। কল-৯
৫০০.০০

দেখতেন। অপরটি হল পরবর্তী সময়ে তাঁর অনুগামীদের মধ্যেই যাঁরা তাঁর রাজনৈতিক লাইনের বিরোধিতা করলেন, সেই সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য।

দুই মলাটে বন্দি চারু মজুমদারের এই রাজনৈতিক জীবনবৃত্তান্তে যে বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছে তার অনেকটা আমাদের জানা। এক ঝলকে তাঁর বিপ্লবভাবনার মূল কথাগুলো এরকম: সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রাম জারি রেখে তার বিকল্প হিসেবে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত

হতে হবে। এই সংশোধনবাদ আন্তর্জাতিক স্তরে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছিল ১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে। তার বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মাও ৎসে দং-এর সশস্ত্র কৃষিবিপ্লবের ধারণা এবং সেটিই হল বর্তমান সময়ে শ্রেণিসংগ্রামের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। তাই চিন বিপ্লবের পথই ভারতের পথ, চিনের চেয়ারম্যান হয়ে দাঁড়ান আমাদের চেয়ারম্যান, চিনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য প্রদর্শন করাটাই একজন বিপ্লবীর অবশ্যপালনীয় কর্তব্য হিসেবে গণ্য করতে হবে। এই পথেই আসবে ভারতবর্ষের শোষিত জনগণের বন্ধনমুক্তি।

চারু মজুমদারের রাজনৈতিক চিন্তায় সশস্ত্র কৃষিবিপ্লবের এই ভাবনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাঁর তরুণ বয়সেই, তেভাগা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে এসে, যার সুবাদে সংগ্রামী কৃষকের ভাবমূর্তি তাঁর মনোজগতে এক চিরস্থায়ী আসন করে নেয়, যা তাঁকে এক নতুন, শোষণের শৃঙ্খলমুক্ত ভারতের স্বপ্ন দেখায়। পাঁচ ও ছয়ের দশকে সিপিআই-এর সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ অবলম্বন করার নীতিকে তাই তিনি মেনে নিতে পারেননি। দীর্ঘ কয়েক দশক জুড়ে উত্তরবঙ্গে ভূমিহীন কৃষকদের সংগ্রামের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত থাকার সুবাদে ১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সূচনা ছিল এই ভাবনারই পরিণতি আর এই প্রশ্নেই পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার যখন প্রতিষ্ঠিত হল, চারু মজুমদার এবং তাঁর অনুগামীরা সশস্ত্র কৃষকসংগ্রামকে শ্রেণিসংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হলেন, যেখানে ইন্ধন জোগাল নকশালবাড়ি আন্দোলন। এখানেই গুরুতর মতপার্থক্য দেখা দিল তাঁর সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারের, অচিরেই সিপিআই(এম)-এর। চারু মজুমদারের সশস্ত্র কৃষিবিপ্লবের এই রক্তিম স্বপ্ন সিপিআই(এম)-এর অনেক কর্মীকে সেদিন আকর্ষণ করেছিল, সিপিআই(এম)-এর কাছে যা এক মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় আসীন হওয়ার ঘটনাটির মধ্যে নিহিত ছিল একটি দ্বিমাত্রিক জটিলতা, যেটি অনুধাবন করার ক্ষেত্রে চারু মজুমদারের নকশালবাড়ির দর্পণে গোটা দেশকে বিচার করে বিপ্লব আসন্ন এমন একটি রোম্যান্টিক ভাবনার নির্মাণ বড় রকমের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যুক্তফ্রন্ট সরকার একেবারে গোড়াতেই স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে শ্রমিক-কৃষক, সাধারণ মানুষের ন্যায্য দাবিদাওয়ার আন্দোলনে কোনও ধরনের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করা হবে না, যেমনটা হত কংগ্রেস আমলে। কিন্তু সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে এই আন্দোলনগুলিকে পরিচালনা করতে হবে নিয়মনীতি মেনে, আর এখানেই বাদ সাধল চারু মজুমদারের লাইন, কারণ তাঁর কাছে এই ভাবনা ছিল সংশোধনবাদেরই নামান্তর। এই যুক্তির নিরিখে সিপিআই(এম)-কে নয়া-সংশোধনবাদী প্রতিপন্ন করা হল, যার পরিণতিতে একদিকে যেমন সিপিআই(এম)-এর বেশ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি চারু মজুমদারের সঙ্গে হাত মেলালেন, অপরদিকে ১৯৬৭ সালে চারু মজুমদার, সৌরেন বসু প্রমুখ একাধিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে সিপিআই(এম) থেকে বহিষ্কার করা হল। ১৯৬৯ সালে সিপিআই(এম-এল) প্রতিষ্ঠিত হল, আনুষ্ঠানিকভাবে মান্যতা দেওয়া হল শ্রেণিশত্রু খতমের, মূর্তিভাঙার লাইনকে, যার অন্যতম তাত্ত্বিক ভিত্তি ছিল ১৯৬৫-৬৭ পর্বে রচিত চারু মজুমদারের আট দলিল।

এর পরের ইতিহাস দ্রুত এবং সংক্ষিপ্ত। সত্তরের দশকের পশ্চিমবঙ্গে বল্গাহীন কংগ্রেসি সন্ত্রাস, সিপিআই(এম-এল) বনাম সিপিআই(এম)-এর রাজনৈতিক সংঘর্ষ, সর্বোপরি চিনের কমিউনিস্ট পার্টির চারু মজুমদারের লাইনের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন তাঁকে ক্রমেই এক রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দেয়। যাঁরা এক সময়ে তাঁর খতম লাইনের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন, তাঁদের এক বড় অংশ এই নীতির যৌক্তিকতা এবং বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করলেন। এই প্রসঙ্গে লেখকের পেশ করা বিস্তারিত তথ্যের পাশাপাশি সন্তোষ রাণা-র *রাজনীতির এক জীবন* (২০১৭) এবং অসীম চট্টোপাধ্যায়-এর *নকশালবাড়িনামা* (২০২২) বিশেষভাবে উল্লেখ্য। পশ্চিমবঙ্গে এবং জাতীয় স্তরে যাঁরা তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরা কানু সান্যাল, অসীম চট্টোপাধ্যায়, সুশীতল রায়চৌধুরী, সত্যনারায়ণ সিংহ, অসিত সেন, সুনীতিকুমার ঘোষ, নাগি রেড্ডি, পরিমল দাশগুপ্ত প্রমুখ।

এই বিতর্কগুলির দিকে নজর দিলে চারু মজুমদারের স্বপ্নপূরণ কেন হল না তার একটা ব্যাখ্যা মেলে। এক, নকশালবাড়ি ও চিনের আয়নায় ভারতবর্ষকে চেনার প্রয়াসটি ছিল বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য একটি একরৈখিক ভাবনা, যা মান্যতা দেয় না এই দেশটির বহুমাত্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক জটিলতাকে। দুই: গণসংগঠন, গণ-আন্দোলনের পথ পরিহার করা, নির্বাচন বয়কট করার ডাককে মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছিল, যার পরিণতিতে চারু মজুমদারের প্রদর্শিত পথ পর্যবসিত হল রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতায়। তিন, সন্তোষ রাণার মতে, নকশালবাড়ি প্রশ্নে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষে না জড়িয়ে হরেকৃষ্ণ কোঙারের পরামর্শ মেনে সমঝোতার পথে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। কথাটার একটি গভীর সারবত্তা আছে। এই ভাবনার সেদিন যদি বাস্তবায়ন হত, তাহলে হয়তো উভয় পক্ষই লাভবান হতেন, যার সুবাদে যুক্তফ্রন্টের কৃষিনীতিতে সংযোজিত হতে পারত এক নতুন মাত্রা, এড়ানো যেত ভবিষ্যতের অনেক সমস্যা। চার: বাস্তব পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে একটি অনমনীয় অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকার যে প্রবণতা চারু মজুমদারের ভাবনাকে বিশিষ্টায়িত করেছিল, তাকে প্রশ্ন করে সন্তোষ রাণা, অসীম চট্টোপাধ্যায়রা গণতন্ত্র ও বহুত্ববাদের পক্ষে একুশ শতকের পৃথিবীতে যে সওয়াল করেছিলেন, তার কোনও হদিস তাঁর চিন্তাচৈতন্যে মেলে না। এখানে অবশ্য একটা কথা বলা প্রয়োজন। চারু মজুমদারের এককালের অনুগামীদের মধ্যে যে নতুন ভাবনার, আত্মসমালোচনার দেখা মেলে, সেটি ছিল সোভিয়েত-উত্তর বিশ্বের ফসল। চারু মজুমদারের জীবদ্দশায় এই ঘটনা ঘটলে তাঁর কী প্রতিক্রিয়া হত বলা কঠিন।

সব শেষে একটি বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। লেখকের সূত্রানুসারে জানতে পারছি, বজ্রকঠিন এই মানুষটি আদতে কিন্তু ছিলেন অতীব সংবেদনশীল এক ব্যক্তিত্ব, ভারতীয় মহাকাব্য, রবীন্দ্রসাহিত্যের গভীর অনুরাগী, ইউরোপীয় সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সমঝদার শ্রোতা, পরিবারের প্রতি যত্নবান। এমন একজন মানুষ খতমের রাজনীতির তাত্ত্বিক—দুটোকে মেলানো আপাতদৃষ্টিতে খুবই শক্ত। কিন্তু এখানেই বোধ হয় বইটির নামকরণের সার্থকতা। উচ্চ পর্যায়ের সাংস্কৃতিক মননই মানুষকে স্বপ্ন দেখায়, বর্তমানকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের এক বিকল্পের সন্ধান দেয়। শোষণমুক্ত ভারতের যে মানবতাবাদী স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তার আধার ছিল এই সাংস্কৃতিক বোধ। তার সঙ্গে মিশ্রণ ঘটেছিল তাঁর অতি প্রবল রাজনৈতিক সত্তার। যুক্তিটা দাঁড়াল এই যে, এক মহৎ স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে হলে হিংসাই একমাত্র পথ, অর্থাৎ, একটি মহান মানবতাবাদী স্বপ্নের বাস্তবায়নের স্বার্থে যদি এক চূড়ান্ত অমানবিক পথ অবলম্বন করতে হয়, তার মধ্যে কোনও ভুল বা অন্যায় নেই। এই দ্বান্দ্বিক সংশ্লেষই তাঁকে পরিণত করেছিল এক স্বপ্নযোদ্ধায়। আর এখানেই ব্যাখ্যা মেলে আরও একটি বিষয়ের: তাঁর একরোখা মানসিকতা, অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি। যিনি স্বপ্ন দেখেন, তিনি লক্ষ্যে অবিচল থাকেন, নমনীয়তা তাঁর কাছে দুর্বলতার শামিল। চারু মজুমদারের স্বপ্ন ছিল এক মানবতাবাদী নতুন ভারত নির্মাণের, যার হাতিয়ার হবে হিংসার রাজনীতি। এটাই ছিল তাঁর জীবনদর্শন, এটাই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। নমনীয়তা, আত্মসমালোচনার অর্থ এই স্বপ্নকেই প্রশ্ন করা, ভেঙে দেওয়া। তাই তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান থেকে যায় অটল, অনড়।

শোভনলাল দত্তগুপ্ত